ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1590-1601
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.380

ভারতে মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অবদান

বীথি দাস, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main theme of the Bhakti Movement that emerged in India in the medieval period, was to attain liberation or salvation through devotion. Many saint gurus preached love and devotion through their bhajans and kirtans during this time. Women saints also contributed equally to the spread of this movement. Some of such notable women saints are Karaikkal Ammaiyar, Andal and Akka Mahadevi from South India, Lal Ded of Kashmir, Mirabai of Rajasthan, Gangasati of Gujrat, Muktabai, Janabai and Bihanabai from Maharastra, Jhanva Devi, Sita Devi, Hemalata Devi from West Bengal etc. However, no such attempt has been made to uphold their biographies and writings in contemporary times. That is why many women saints may have remained in the shadow of History. Each of them is an outstanding devotee who has renounced everything and became a Goddess. Besides, they have played an important role in the history of Bhakti. In this movement, devotion means complete surrender at the feet of God and these women have fulfilled it by expressing self-sacrifice and deep love for God. Some of them have accepted God as their father, some as their husband and some as their friend. In their lives, some have played the role of a supreme devotee, some a renunciative saint, some a worldly devotee and some a guru. They have portrayed each role skillfully and have proven that everybody can meet God. Some of them are devotees of God with attributes and some are the devotees of the attributeless God but the conditions for walking on both paths are the same. Only a simple, honest and pure heart can attain the Supreme Soul through detachment and surrender. Their bhajans, kirtans and compositions are notable in this regard.

Keywords: Bhakti, Women, Medieval period, God, Surrender, Saint, Devotion

নারী পুরুষের সমতা খুজতে গেলে আমাদের যেতে হবে সম্ভবত মানব সভ্যতার একেবারে আদিম পর্যায়ে, যখন শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ ছিল তাদের পেশা। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে এই পেশাই নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিল, শেষপর্যন্ত যা পরিণতি পায় বর্তমানের পুরুষশাসিত সমাজ ব্যাবস্থায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা কখনো পিছিয়ে থাকেননি, তারা সংগ্রাম করে গেছেন এবং আজও করছেন। বর্তমানে অনেক নারীবাদী ঐতিহাসিক, এই সমস্ত সংগ্রামী নারীদের ইতিহাসের আলোয় তুলে ধরেছেন। আজকের আলোচনায় আমি, ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে এইরূপ কিছু অসামান্য নারী ভক্তের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ভক্তি আন্দোলন শব্দদুটিকে আক্ষরিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ভক্তি এবং আন্দোলন এই দুটি শব্দ আমরা পাই। ভক্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে যেমন দেশভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি কিন্তু আলোচ্য অংশে ভক্তির

তাৎপর্য আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। ভক্তি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ভজ' থেকে যার অর্থ হল সেবা করা বা অর্চনা করা। আন্দোলন শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল সঞ্চালন বা আলোড়ন। বিশ্বের প্রতিটি আন্দোলনই সংগঠিত হয়ে থাকে প্রচলিত ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ।প্রাচীন ভারতে যেমন প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল আচারসর্বস্ব গোঁড়া জাতপাতভিত্তিক ব্রাহ্মন্যধর্মের বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনই মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে ভক্তি আন্দলনের উত্থান ঘটেছিল তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অহিংসা ও সাম্যের আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য অনেকাংশে হ্রাস করলেও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও রূপান্তরের মাধ্যমে নিজের স্থান পুনরায় দখল করে নিতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, বৈদেশিক আক্রমন, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুলিও ধীরে ধীরে লোপ পায়। আদি মধ্য যুগ থেকেই ভারতীয় ধর্মে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা জায়। হিন্দু সমাজে তখন শৈব, বীরশৈব, শক্তিপূজা, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। নবম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারনা দ্বারা এক নতুন হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু করেন। আচারসর্বস্বতা যা সনাতন ধর্ম কে গ্রাস করেছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি জ্ঞানমার্গের পথ দেখান, যার ভিত্তি ছিল বেদান্ত দর্শন। তাঁর প্রধান মন্ত্র ছিল 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা'। অর্থাৎ জীবাত্মা সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের থেকে অভিন্ন, তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তার মতে এই জ্ঞানই হল মুক্তি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বহু দেবতার আরাধনাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। এর ফলে সমাজের কিছু মানুষ গৃহে বা মন্দিরে পূজা করত আর কিছু মানুষ জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সমাজের নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হত এবং জ্ঞানমার্গ তাদের কাছে ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। তাদের আবেদন, ছিল সহজ ও সরল কোন পন্থার যাতে তারাও ভক্তির পথে চলতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভক্তিবাদের উন্মেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ডক্টর রামশরণ শর্মার মতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে তুর্কিদের আগমনের আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতির ফলে উত্তর ভারতে স্থানীয় ভুমধ্যকারীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল, যার ফলে ব্রাহ্মন্যধর্মও রক্ষণশীল হতে থাকে। পুনরায় সমাজে বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইসলামের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও বিশ্বজনীন ভাতৃত্বের দ্বারাই ভক্তি আন্দোলনের নেতারা অনুপ্রাণিত হন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মুসলিম শাসকদের নির্যাতনে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকায় ভক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে একেশ্বরবাদ ও ভক্তির ধারণা ভারতে এসেছিল। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভক্তির ধারণা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। ভক্তি শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গেছে ঋকবেদে, বৃহদআরণ্যক উপনিষদে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, কঠ ও কৌশিতকী উপনিষদেও। শ্রীমদভাগবত গীতার ভক্তিযোগ নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভক্তি ধর্মের মূল কথা হল ভক্তির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি। ভাগবত পুরাণেও এই ভক্তি ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

ভক্তি আন্দোলন প্রথম সূচিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। নায়নার বা শৈব ভক্তি এবং আলবার বা বৈষ্ণব ভক্তি এই দুটি ভাগে ভক্তি আন্দোলন এখানে বিকশিত হয়। মূলত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে ভক্তি আন্দোলন এখানে সোচ্চার হয়েছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রবক্তা রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক। কন্নড় ব্রাহ্মণ মাধাবাচার্য মাধবপন্থী মতকে এবং তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক, মথুরায় রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি জনপ্রিয় করেছিলেন। তেলেগু বৈষ্ণব বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তার উদ্যোগে রাজপুতানা ও গুজরাটে ভক্তিবাদ প্রসারিত হয়। উত্তর ভারতে ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করেন রামানন্দ। মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বারকরী সম্প্রদায়। জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবকে

এই বারকরী মতের সূচনাকারী বলা হলেও একে আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন নামদেব। মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনে আরাধ্য ছিলেন বিঠোবা, যিনি হলেন শ্রীবিষ্ণুর এক রূপ। এই মতের অপর এক সাধক হলেন তুকারাম। এদের রচিত ভক্তিগীতিগুলিকে বলা হত অভঙ্গ। বাংলায় ভক্তিবাদের প্রধান কান্ডারী ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব। কৃষ্ণপ্রেমের মাধ্যমেই যে মানুষ মুক্তি পেতে পারে একথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

পূর্বে ধর্মীয় কার্যাবলীতে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাই ছিল প্রধান, সেখানে শূদ্র ও চণ্ডালের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভক্তি আন্দোলন সকলের কাছে ঈশ্বরকে উন্মুক্ত করে দেয়। কোন মাধ্যম ছাড়াই মানুষ ঈশ্বরের সেবা করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। নতুন এই ধর্মে বিভিন্ন শ্রেণী আর সম্প্রদায়ের গুরুরা প্রাধান্য পান। এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তিমূলক রচনা। যার ফলে এই সন্ত মহাত্মারা তাঁদের বার্তা খুব সহজেই সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন।

ভক্তি আন্দোলনের এই বিকাশ নারীদের দুইভাবে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় সমাজ ব্যাবস্থায় নারীরা চার দেওয়ালে আবদ্ধ থাকত এবং রীতিনীতির বেড়াজালে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বাধ্যতামূলক মস্তক মুণ্ডন করতে হত, এক বেলা আহার করতে হত। সধবাদের কঠোর নিয়মনীতি যেমন ব্রত, উপবাস, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া প্রভৃতি করতে হত। ব্রাহ্মণদের প্রভাব হ্রাস পেলে নারীদের এই দুরবস্থারও উন্নতি হয়। দ্বিতীয়ত, একজন নারী যেকোনো সময় ঈশ্বরের সেবা ও স্মরণ করতে পারত, নিজের কাজে কর্মরত অথবা শিশু সামলাতে ব্যাস্ত অবস্থায় কিংবা শারীরিক অসুস্থতায় থাকলেও। এই তত্ত্ব নারীর স্বাধীনতাকে আরও বর্ধিত করে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, বাহ্যিক আচারগত পবিত্রতা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কর্ম ও চিন্তার পবিত্রতা রক্ষা। নারীরা তখন সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভক্তিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এই নারীরা শুধু অনুগামী ভক্ত রুপেই নয় বরং ভক্ত গুরু এবং সন্ত রূপেও অবতীর্ণ হন। নারী ও পুরুষ উভয় সন্তই প্রশ্ন তুলেছিলেন, পরমাত্মা যিনি নারী ও পুরুষ দেহে অবস্থান করেন তিনি কি পৃথক ? এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই ধর্মে নারীর অংশগ্রহণকে বৈধতা দেয়। ভারতীয় নারী যারা চার দেওয়ালের অন্তরালে ছিলেন তারা সাহসের সঞ্চার করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনে যোগদান করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্ণাটকের বীরশৈব সম্প্রদায়ের বহু নারী সন্ত দার্শনিক আলোচনা সভা 'অনুভব মণ্ডপে' যোগদান করেন। মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায়ের অনেক মহিলা পান্ধারপুরের বিঠোবা ভগবানের উদ্দেশে দ্বিবার্ষিক তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন।

এত কিছুর সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যাবস্থায় নারীর উত্থানের পথ এতটা সুগম ছিল না। যে সমস্ত নারী সাধিকারাই এইসময় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে অনেক বাধিবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উল্লেখনীয় যে, নারীরা যখন স্পষ্টবাদী হয় এবং স্বাধীন ভাবে বাঁচার দাবী তোলে তখনও কিন্তু পুরুষরা সমাজে নারীর অবস্থা নিয়ে উদাসীন। নারীদের অবস্থার উন্নতি নিয়ে কোন সন্তই কথা বলেননি। আরও একটি বিষয়, ভক্তি আন্দোলনের পুরুষ সন্তদের ব্যাপারে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও নারী সন্তদের সম্পর্কে তা খুবই কম। তার কারণ ভক্তি একটি মৌখিক ঐতিহ্য ছিল এবং অন্যান্য প্রাচীন উৎসের মত এখানেও পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য ছিল প্রভাবী এবং নারী মতকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কোন রাজা বা শাসক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি এবং তাদের ব্যাপারে কোন ধর্মীয় সাক্ষ্যও পাওয়া যায় না। তাদের কথা বেশিরভাগই পরবর্তীকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লেখক বা জীবনীকারদের দ্বারা উদ্ধৃত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এসব কাহিনীতে অনেক মিশ্রণও চলে আসে। তাদের রচিত ভজন ও কবিতাগুলি থেকেই তাদের জীবনের কিছু ঝলক পাওয়া যায়। এইরকম কিছু নারী সন্তদের কথাই আমরা জানব।

করাইক্কালআম্মাইয়ার:

করাইক্কালআম্মাইয়ার একজন শৈব নায়নার ভক্ত ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল পুনিতাবতী। চোল রাজ্যের বন্দর শহর করাইকলের এক ধনী বৈশ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ভগবান শিবের প্রতি তাঁর ভক্তি অপরিসীম। তাঁর বিবাহের বয়স হলে নাগাপট্টিনামের এক যুবকের সাথে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। তিনি শিব ভক্তদের অবাধে স্বর্ণ, বস্ত্র ইত্যাদি দান করতেন। একদিন তাঁর স্বামী বাড়িতে দুটি আম পাঠালে পুনিতাবতী একটি আম এক শিবনাদিয়ারকে দিয়ে দেন। তার স্বামী একটি আম খেয়ে সুস্বাদু অনুভব করায় দ্বিতীয় আমটিও খেতে চায়। তখন পুনিতাবতী উপায় না পেয়ে শিবের ধ্যানমগ্ন হন এবং প্রার্থনা করতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি একটি আম পেয়ে যান। তার স্বামী আমটি খেয়ে সন্দেহাতীত হয়ে প্রশ্ন করে এমন আম ত্রিভুবনে কোথাও পাওয়া যায় না তিনি সেটি কোথায় পেলেন। তখন পুনিতাবতী সত্যিটা তার স্বামীকে জানালে তাঁর স্বামী প্রমাণ চায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি আরেকটি আম হাজির করলে তাঁর স্বামী ভয় পেয়ে যায়। তাঁর স্বামী তাকে জানায় যে, তিনি একজন দেবী এবং সে তাঁর সাথে সংসার করতে পারবে না। এই ঘটনায় আহত হয়ে পুনিতাবতী ভগবান শিবের কাছে তাকে প্রেত বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান শিব তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করেন। তারপর তিনি কৈলাস পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখলে সবাই পালিয়ে যেত। সেই পবিত্র পর্বত পায়ে হাঁটার পরিবর্তে তিনি মস্তকে আরোহণ করেন। মাতা পার্বতী তাঁর এই রূপ দেখে বিস্মিত হলে শিব পার্বতীকে বলেন যে, তাঁর ভক্তই এই রূপের প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কাছে আসতেই শিব তাকে 'আম্মাই' (মা) বলে সম্বোধন করলেন এবং তাঁর কাছে গেলেন। পুনিতাবতী ভগবান শিবকে 'আপ্পা' (বাবা) বলে ডেকে সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলেন। ভগবান শিব সানন্দে তাঁর ইচ্ছাগুলি পূরণ করলেন, যথা- চিরস্থায়ী ও সুখকর শিব ভক্তি; জন্মের অবসান (মোক্ষ); চিরস্থায়ী শিব চেতনার অবস্থা এবং ভগবান শিবের পবিত্র চরণতলে থেকে তাঁর নৃত্য দর্শন করতে করতে আনন্দের সাথে তাঁর মহিমা কীর্তন করা। এরপর শিব তাকে দক্ষিনে তিরুভালঙ্গানাডুতে যেতে বললেন। সশ্রদ্ধভাবে বিদায় জানিয়ে তিনি সেখানে রওনা হলেন। সেখানে তিনি পরম আনন্দে ভগবান শিবের তাণ্ডব নৃত্য দেখে সেই উচ্ছ্বাস তার ভক্তিগীতিতে তুলে ধরেন, যা 'তিরভলঙ্গত্তু মুত্ত তিরুপ্পাদিগম' নামে পরিচিত। এটি হল তিরুভলঙ্গাদু মন্দিরের শিবের উদ্দেশে রচিত দুটি দশক, এর মধ্যে এগারোটি করে গান রয়েছে যার বিষয়বস্তু হল শিবের নৃত্য, শ্মশান এবং সেখানকার ভুতেদের কার্যকলাপ। এছাড়া তিনি ভগবান শিবের উদ্দেশে 'তিরুভিরাত্তাই মণিমালাই' রচনা করেন। এটিতে কুঁড়িটি শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণের তাৎপর্য, প্রভুর চরণ পূজা, শিবের ধ্যানের মত বিষয়গুলি পাওয়া যায়। 'অর্পুদা তিরুভান্দাদি'কে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে প্রথম বলে মনে করা হয়। এটি প্রবন্ধের 'আন্দাদি' শ্রেণির অন্তর্গত, তামিলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আন্দাদি রচনার কৃতিত্ব তারই। এটি একটি সরল ও মনোরম রচনা, যা ভক্তদের হৃদয়কে বিগলিত করে সহজেই। এটিতে ভগবান শিবের কর্ম, খ্যাতি ও প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এছাড়া এটিতে তাঁর ব্যাক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাও আছে। ৬৩ জন নায়নার সন্তের মধ্যে তিনিই প্রথম সঙ্গীত ও পদ্য রচনার সমন্বয় ঘটান। তাঁর কবিতায় তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, ভগবান শিবকে সর্বদা তাদের চিন্তন করতে, তাকে যে রূপেই ভাবা হয় তিনি সে রূপেই আবির্ভূত হন, তিনি সর্বদা আমাদের সাথেই আছেন। তিনিই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং আত্মা এর মাধ্যমে নিজেকে অষ্টমূর্তি রূপে প্রকাশ করেন। কেবল তাঁর কৃপাতেই জন্মের অবসান ঘটে এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যারা তাঁর শরণাপন্ন হন তিনি তাদের রক্ষা করেন। করাইক্কালআম্মাইয়ার এর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালের তামিল শৈব ধর্মকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর রচনাগুলি স্বচ্ছতা, সারল্য ও স্পষ্টবাদীতার জন্য প্রশংসনীয়।

অন্দাল:

সন্ত কবিয়ত্রী অন্দাল যার আসল নাম হল গোদাদেবী। তিনি ছিলেন ১২ জন আলবার বৈষ্ণবদের মধ্যে একজন। অন্দাল ছিলেন বিখ্যাত আলবার বৈষ্ণব পেরিয়ালওয়ার বা বিষ্ণুচিত্তের পালিতা কন্যা। কিংবদন্তি অনুসারে পেরিয়ালওয়ার তাঁর বাগানের তুলসী অরণ্যের নীচে অন্দালকে খুঁজে পান। তিনি তাকে ভালোবেসে গোদা নাম দেন যার অর্থ পৃথিবীর উপহার। শৈশব থেকেই অন্দালের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র প্রেম ছিল এবং তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী বলে মনে করতেন। তাঁর পিতার অনুপস্থিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গাঁথা মালা পরিধান করে তা পুনরায় রেখে দিতেন। একদিন তাঁর পিতা এটি দেখে ফেলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন এই মালা আর শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যাবে না। এই ঘটনায় ভগবান বিষ্ণু পেরিয়ালওয়ারকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র গোদার পরিধান করা মালাই গ্রহণ করবেন। এতে পেরিয়ালওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোদা প্রকৃতই ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী এবং তিনি সেই মালাই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে অন্দালের শ্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ও প্রেম আরও তীব্র হতে থাকে। তিনি নিজেকে বৃন্দাবনের গোপী স্বরূপ মনে করে বিভিন্ন ব্রত পালন করতে থাকেন। একদিন শ্রী রঙ্গনাথ (শ্রী বিষ্ণুর আরেক রুপ) পেরিয়ালওয়ারের স্বপ্নে আসেন এবং তাঁর কন্যার পানি গ্রহণের অনুমতি চান। অন্দালকে বিবাহের সাজে শ্রী রঙ্গনাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি শ্রী রঙ্গনাথের বিগ্রহে বিলীন হয়ে যান। তারপর থেকেই তামিলনাড়ুতে অন্দাল শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী হিসেবে পূজিত হন। অন্দালের দুটি বিখ্যাত রচনা হল 'তিরুপ্পাভাই' ও 'নাচিয়ার তিরুমোঝি'। এই দুটি রচনাই সাহিত্যকর্মে অনন্য। তিরুপ্পাভাই হল ৩০টি ভক্তিমূলক গীতির সংকলন যেগুলিকে 'পাশুরাম' বলা হয়, সেখানে অন্দাল নিজেকে একজন গোপী হিসেবে তুলে ধরেন যিনি প্রভুর চিরন্তন সঙ্গ লাভের কামনা করতেন। উল্লেখনীয় যে, অন্দাল তার সমবয়সী সকল মেয়েকে ব্রত এবং 'কৃষ্ণানুভব' এর জন্য আহ্বান করেছিলেন। নারীদের কোন মহৎ ও উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্যে সংগঠিত করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন। সুতরাং বর্তমানকালের নারী সংগঠনগুলির পথিকৃৎ তাকেই বলা যায় নিঃসন্দেহে। তাঁর সঙ্গীতগুলিতে সদা শ্রী বিষ্ণুর শরণে থাকার অভিব্যাক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। এই গানগুলিতে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের তিনটি মূলমন্ত্র যথা থিরুমন্ত্রম, ধ্যানম ও চরমশ্লোকম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির তাৎপর্য হল, পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত আছেন। এই গানগুলিতে শুধু পরম গন্তব্যই নয়, সেই গন্তব্যে যাওয়ার পথও ব্যাখা করা হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ একটি পাশুরামে অন্দাল বলেছেন, একজন শিষ্যকে এই তিনটি মন্ত্রের এমনকি বেদের মর্মার্থ বুঝতে গেলেও আচার্যের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তিরুপ্পাভাই এর ৩০টি সঙ্গীতের প্রথম পাঁচটি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তপস্যা এবং প্রার্থনার কথা বলে। পরবর্তী দশটি সঙ্গীতে সম্মিলিতভাবে ভগবানের সেবায় অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সঙ্গীত মন্দির পরিদর্শনের বর্ণনা দেয়, শেষ সঙ্গীতটিতে অন্দালকে বিষ্ণু চিত্তের কন্যা হিসেবে ব্যাখা করা হয়েছে যিনি এই ৩০টি সঙ্গীত ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। তিরুপ্পাভাই এর সবথেকে বিখ্যাত সঙ্গীত হল ২৯তম পাশুরাম, যেটি আজও অনেক ভক্ত তাদের দৈনিক প্রার্থনায় গেয়ে থাকেন। এই সঙ্গীতে বলা হয়েছে, বারংবার ভগবান বিষ্ণুর দর্শন করে তাঁর পাদপদ্মে মাথা নোয়ানো এবং তাঁর স্তুতিপাঠ করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তার আশীর্বাদ এবং বরলাভের জন্য নয় বরং এই মিনতি করার জন্য যে, পরবর্তী সাত জন্মে আমরা ভক্তরা যেন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি এবং সমস্ত কামনা বাসনা যেন আমাদের মন থেকে দূরীভূত হয়। নাচিয়ার তিরুমোঝি তে, অন্দাল ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন জল ছাড়া মাছ যেমন ছটফট করে ঠিক তেমন ব্যাকুলতার সাথে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করলেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। অন্দালের রচনাগুলিতে এই নশ্বর জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যের প্রতি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আক্কা মহাদেবী:

আক্কা মহাদেবী কর্ণাটকের শিবমোঙ্গা জেলার উদুটাডিতে ১১৫০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতামাতা বীরশৈব মতবাদের অনুগামী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি শিবের গভীর ভক্ত ছিলেন এবং অল্পবয়সেই একজন অজানা গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেন্নামল্লিকার্জুন (শিবের এক রুপ) এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়। ষোল বছর বয়সেও তিনি অবিবাহিত ছিলেন, যা সেই সময়ে একটি বিরল প্রথা ছিল। এর কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চেন্নামল্লিকার্জুন এর সাথেই তাঁর বিবাহ হয়েছে। তবে তিনি বেশিদিন বিয়ে এড়াতে পারেননি, কৌশিকা নামে এক গোষ্ঠীপ্রধান তাকে বিয়ে করতে চান এবং তাঁর পিতামাতাকে রক্ষার জন্য তিনি শর্তানুযায়ী বিয়েতে রাজি হন। কিন্তু কৌশিকা যখন শর্ত উলঙ্ঘন করে তাঁর সাথে জবরদস্তি করার চেষ্টা করে তখন তিনি সমস্ত কিছু এমনকি পরিধানের বস্ত্রও ত্যাগ করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিংবদন্তি অনুসারে কেশরাশি দ্বারা তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখতেন। প্রথমে তিনি কর্ণাটকের বিদর জেলার কল্যান শহরে পাড়ি দেন এবং এখানের ধর্মীয় সভা অনুভব মণ্ডপে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের জন্য আলাম্মা প্রভু এবং বাসবেশ্বর এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। আলাম্মা প্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আমি ভাব ও তুমি ভাব' থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে তবেই তিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত করে ঈশ্বরের দর্শন করতে পারবেন। কিছুদিন পর মহাদেবী অনুভব মণ্ডপ ত্যাগ করেন এবং এক কষ্টকর যাত্রার পর শ্রীশৈলম পর্বতে পৌঁছে তাঁর প্রভু চেন্নামল্লিকার্জুন এর আরাধনায় মগ্ন হন। কথিত আছে, তাঁকে বনের গুহা ও ঝরনার কাছে ঘুরে বেড়াতে এবং গান গাইতে দেখা যেত। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে ৪৩০ টি বচন লিখেছিলেন যা কন্নড় সাহিত্যের এক অন্নতম নিদর্শন। এই বচনগুলিতে তিনি নিজেকে 'অঙ্কিতা' বলে পরিচয় দিতেন। এগুলির মাধ্যমে মহাদেবী তাঁর গভীর প্রেম, আকুতি এবং বিরহের যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাঁর শেষদিকের একটি বচন থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার ও বহু আধ্যাত্মিক সাধনার পর অবশেষে তিনি তাঁর প্রভু চেন্নামল্লিকার্জুন এর দর্শন পেয়েছিলেন।

লাল দেদ:

লাল দেদ ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কাশ্মীরের একজন ভক্তিবাদী সাধিকা। তিনি শ্রীনগরের কাছে পান্দ্রেথান গ্রামে জন্মগ্রহন করেছিলেন যা বর্তমানে কাশ্মীর নামে পরিচিত। তাঁর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন লাল্লা আরিফা। এছাড়াও তিনি লাল্লা যোগেশ্বরী, লালেশ্বরী বা লাল্লা নামেও পরিচিত। বারো বছর বয়সে পামপুর অঞ্চলের নিকা ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মনের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। সেখানে শাশুড়ির দ্বারা তিনি যন্ত্রণার শিকার হতেন। আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার সন্ধানে তিনি তাঁর পৈতৃক এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবার উভয়ই ত্যাগ করেন। বাস্তু জীবনের মায়া-মোহ ত্যাগ করে তিনি ঈশ্বরের খোঁজে কাশ্মীরের পাহাড় এবং উপত্যাকা ভ্রমণ করতে থাকেন। গৃহ ত্যাগ করার সময় তিনি তাঁর বস্ত্রও ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি শারীরিক দেহ অপেক্ষা আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই নারী সাধিকা প্রচলিত পুরুষশাসিত পারিবারিক কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সাথে সরাসরি এবং ব্যাক্তিগত সংযোগ স্থাপনের ধারণা প্রচার করেছিলেন। লাল্লা তাঁর জীবনে শত শত গান লিখেছিলেন যেগুলি 'ভখ' নামে পরিচিত কিন্তু সেগুলি সমসাময়িককালে সংগ্রহ বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই গানগুলি কাশ্মীরি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর গানগুলো সরল প্রকৃতি কিন্তু একই সঙ্গে গভীরতা ও বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত। উল্লেখনীয় যে, অন্যান্য ভক্তিবাদী সন্তদের মত লাল দেদ তাঁর এই সঙ্গীতগুলো ভক্তি প্রচারের উদ্দেশে নয় বরং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্যই রচনা করেছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগের পরামর্শ

দেননি বরং তাঁর মতে সেই প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমী যে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহম, দয়া ও ভালোবাসা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যায়। তিনি মূর্তিপূজাকে স্বীকৃতি দেননি বরং তিনি বলেন যে, প্রকৃত পূজা হল ভগবানের নিরন্তর স্মরণ করা। আত্মার উচ্চতম স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য তিনি নৈতিক ও মানসিক বিশুদ্ধতার পাশাপাশি মনকে সংযমে আনার জন্য শ্বাস বায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেন। লাল দেদের ভাষায়, পরম আত্মা হলেন চিদানন্দ জ্ঞান প্রকাশ অর্থাৎ চিৎ-আনন্দ; কেবল চিৎ বা বিশুদ্ধ (অবিভক্ত) চৈতন্যই নন, বরং আনন্দও। ভগবানকে চিন্ময় এবং অন্তর্জগৎ উভয়েই দেখা যায়, কেবল সাক্ষী আত্মাতেই নয় বরং নাম ও রূপের জগতেও, প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মধ্যেও। আর এভাবেই লাল দেদ উপলব্ধি করেন সেই পরম ঈশ্বরকে যিনি আরোহী রূপে আরোহণ করেন। সাধকগণ একেই উচ্চতম অবস্থা, মোক্ষ বলে মনে করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি কাশ্মীরি শৈব মতাবলম্বী বা হঠযোগিনী ছিলেন। তবে যাই হোক মধ্যযুগীয় পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর জীবন ও শিক্ষা ছিল বিপ্লবী।

মীরা বাই:

মীরা বাঈ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজস্থানের একটি ছোট রাজ্য শাসনকারী রাঠোর রাজবংশের মহারাজা রতন সিং ও বীরকুনওয়ারির কন্যা ছিলেন। মীরার পৈতৃক পরিবার বৈষ্ণব ছিল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মীরাও বৈষ্ণব ভক্তি প্রাপ্ত হন। কিংবদন্তী অনুসারে একদা অল্প বয়সে একটি বিবাহ শোভাযাত্রা দেখার পর মীরা বাঈ তাঁর মাকে তাঁর বর কোথায় বলে বিরক্ত করতে থাকলে তাঁর মা তাকে এড়ানোর জন্য শ্রী কৃষ্ণের একটি মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে ইনিই হলেন তাঁর বর। তারপর থেকে মীরা শ্রী কৃষ্ণকেই নিজের স্বামী বলে গ্রহণ করেন। রাঠোররা মেওয়ারের সিসোদিয়া রাজপুতদের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য মীরাকে সেখানে বিয়ে দিতে উদ্যত হন। মীরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েটি হয়। তাঁর স্বামী হিসেবে মহারাজ কুম্ভ অথবা রানা সাঙ্গার পুত্র ভোজরাজের কথা বলা হয়। কথিত আছে যে, মীরা বাঈ যখন শ্বশুরবাড়ি আসেন তখন তাঁর স্বামী এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য তাঁকে দেবী শক্তির পূজা করতে বলা হয় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ শ্রী কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর পতি এবং পরমেশ্বর উভয়ই। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষয়টি তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি এবং এই ভক্তির জন্য তাঁকে প্রতিদিনই অনেক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত। তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁকে হত্যা করার বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরপর তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একটি মন্দিরে থাকতে শুরু করেছিলেন কিন্তু এখানেও শান্তি পাননি। অবশেষে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং অনান্য সাধু সন্তদের সাথে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্দির এবং স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি প্রথমে ডাকুর পরে বৃন্দাবন এবং অবশেষে দ্বারকায় যান। কিংবদন্তি আছে যে সম্রাট আকবর এবং তানসেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বারকায় আসেন এবং তানসেন সেখানে একটি ভজনও গেয়েছিলেন। যখন দ্বারকা সমুদ্র উপকূলের রণছোরজি মন্দিরে তিনি ছিলেন তখন তাঁর পরিবারের মানুষেরা তাঁকে ফিরে আসতে রাজি করানোর জন্য একদল পুরোহিতকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিল। মীরা বাঈ ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা মন্দিরের বাইরে আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পরেন এবং ব্রাহ্মণ রক্তপাতের কারণ হতে চাননি। এরপর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং বলা হয় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে বিলীন হয়ে যান। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি সমুদ্রমুখী পশ্চিমী দরজা দিয়ে সমুদ্রে ঝাপ দেন। যাই হোক মীরার ভক্তি রাজপুত বিবাহ ব্যাবস্থার মূলে থাকা স্বার্থ ও আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর কাহিনী যুদ্ধ, প্রতিহিংসা এবং রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির একটি যুগ এবং সমাজে, প্রেমের নীতিকে তুলে ধরে। মীরা তাঁর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রচুর ভজন রচনা করেছিলেন। তিনি যে রাজপুত বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাদের আদেশে বহু শতাব্দী ধরে তাঁর নাম ও ভজন উল্লেখ করার

অনুমতি ছিল না। তবে চারণকবি এবং অস্পৃশ্য বর্ণের নারীরা গোপনে তাঁর গানগুলি গেয়েছিলেন বলে সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর ভজনগুলি আজ সারা ভারতে সুপরিচিত। তাঁর কিছু বিখ্যাত ভজন হল, "পায়োজি ম্যায়নে রাম রতন ধন পায়ো", "পগ ঘুঙ্গরু বান্ধ মীরা নাচি রে", "এয়সি লাগি লগন মীরা হো গ্যায়ি মগন", "হরি তুম হরো জন কী ভীর", "মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরো না কোই" ইত্যাদি। তাঁর ভজনগুলিতে তাঁর অন্তরের বিরহ ও বেদনা ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর প্রেমিক শ্রী কৃষ্ণের সমালোচনা করে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে মিষ্টি কথায় আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে তাঁর প্রেমে মত্ত করেন কিন্তু তারপর তিনি তাকে অগ্রাহ্য করে একা ফেলে চলে যান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রেমিক বলে নিন্দা করেন। এই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা মীরা বাঈ এর জীবনে চলতে থাকে তবুও তিনি আশা ছাড়েন না। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ছিল মুক্তির প্রতি আকর্ষণ। নির্যাতন, অবজ্ঞা, দুঃখ, কষ্ট সত্ত্বেও মীরা বাঈ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার নিঃশর্ত প্রেম ত্যাগ করেননি। ভক্তির পথে চলে আপামর ভক্তের কাছে তিনি ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। সাধিকা হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক নারী যিনি তাঁর সময়কালের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় মুক্তি অর্জন করেছিলেন।

গঙ্গা সতী:

গঙ্গা সতী ছিলেন গুজরাটের একজন ভক্ত নারী। তাঁর রচনাগুলো সমকালীন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং মৌখিক ঐতিহ্যেই সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে, তাই তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি হয়নি কখনও। তাঁর বিবাহ হয়েছিল সৌরাষ্ট্রের কালুভ নামক একজন রাজপুতের সঙ্গে যিনি নিজেও ভজন এবং সাধুসঙ্গ ভালবাসতেন। তাঁদের গৃহ শীঘ্রই একটি মন্দিরে পরিণত হয়। তাঁর স্বামী সংসারে অনাসক্ত হয়ে সমাধি গ্রহন করেন। গঙ্গাসতীও সমাধি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কালুভ তাকে বলেছিলেন সমাধি গ্রহণের আগে তাদের পুত্রবধূ পান বাঈকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে যেতে। এই উদ্দেশে গঙ্গা সতী পান বাঈ এর জন্য প্রায় চল্লিশটি ভজন রচনা করেন যেখানে তিনি তাকে সত্যের পথে শিক্ষা দেন। গঙ্গা সতী যখন ঈশ্বরের কথা বলেন তখন কিন্তু তিনি হিন্দু দেবদেবীদের কথা বলেননি বরং পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ গুন ও রূপহীন পরমাত্মার কথাই বলেন, যার সঙ্গে মানব আত্মা কেবল কঠোর অনুশাসন ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই মিলন লাভ করতে পারে। তিনি এক্ষেত্রে প্রকৃত গুরুর আনুগত্যের উপর জোর দেন, তিনি বলেন প্রকৃত গুরুর গুণাবলী শিষ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, কামনা ও বাসনার উপর বিজয় লাভ, অহম বিসর্জন এবং ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি। তিনি দিব্য অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা যোগাভ্যাসের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর একটি ভজনে তিনি বলেন, 'মেরু পর্বত হয়তো টলে যেতে পারে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হতে পারে কিন্তু একজন হরিজনের মন কখনো টলে না, সুখ দুঃখ প্রভৃতি তার মনকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না, সে গুরুর আদেশ মেনে চলে এবং অহমকে বিসর্জন দিয়ে গুরুর চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে'। এভাবেই মহাত্মা গান্ধীর ছয় শতাব্দী আগেই তিনি 'হরিজন' শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন।

মুক্তা বাঈ:

মহারাষ্ট্রের মুক্তা বাঈ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বারকরী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব এবং সোপানের বোন ছিলেন। তাদের পিতা একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহন করার পর পুনরায় সংসার জীবনে ফিরে আসলে তাদের পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ তাদের চার ভাইবোনকে অনাথ করে দিয়ে তাদের পিতামাতা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন। মুক্তার জীবন তাঁর ভাইদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল এবং যেখানেই তারা যেত একটা ছোট পরিবারের মত একসঙ্গে থাকত।

তারা সকলেই ছিল অবিবাহিত। মুক্তা বাঈ ছিলেন একজন সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণী, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত উন্নত এবং বিদূষী। অনান্য নারী ভক্তের মত তিনি কখনো তাঁর নারীত্বকে জাহির করেননি। তিনি সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশটির মত অভঙ্গ রচনা করেছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ অভঙ্গগুলোই সন্তদের সাথে কথোপকথনের আকারে রচিত এবং তিনি নিজেকে তাদের সমকক্ষ হিসেবে মনে করতেন। যেমন, "নিবৃত্তি মুক্তি সংবাদ" এ তিনি এবং তাঁর ভাই নিবৃত্তি একে অপরকে নির্দেশ দেন।

জনা বাঈ:

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের বার করী সাধকদের মধ্যে এক অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। জনা বাঈ এক নিম্নবর্গীয় শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন তাঁর মাত্র সাত বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মা তাকে শ্রদ্ধেয় বারকরী গুরু নামদেবের পিতা দামা শেট্টীর পরিবারের হাতে তুলে দেন। জনা বাঈয়ের বাকি জীবনটুকু সেই গৃহেই কেটেছিল। তিনি বর্ণনা করেছেন সেই গুরুভার ও অন্তহীন গৃহকর্মের কথা, যা তার ভাগ্যে জুটেছিল। একজন নারী হিসেবে জীবনযাপনের কঠোরতা এবং গৃহস্থালির শ্রমের বোঝা এই দুটি বিষয়ই তাঁর রচনায় সর্বদা উপস্থিত ছিল। পান্ধারপুরের অধিষ্ঠাতা ভগবান বিঠোবা তাঁর কাছে কেবল ভগবানই নন বরং একজন বন্ধু, এক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন এবং তাঁর কঠোর গৃহকর্মের পথে এক অবিচল ও নিত্যসঙ্গী ছিলেন। জনা বাঈ বেশ কিছু অভঙ্গ রচনা করেছিলেন এবং এই অভঙ্গগুলো 'নামদেব গাথা'তে স্থান পেয়েছে। জনা বাঈ এর অন্যতম সুপরিচিত একটি অভঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, বিঠোবা তাকে ভালবেসে চুল ধুয়ে ও বিনুনি করে দিত, স্নানের জল বয়ে আনা ও তা গরম করা, আঙিনাতে ঝরে পরা পাতা ঝাট দেওয়া, বাসনপত্র মাজা এমনকি মাথায় উকুন কামড়ালে তাঁর মাথা চুলকে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজই করে দিত। তাঁর অভঙ্গগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তরের গভীর ভক্তি ও ভগাবানের সাথে তাঁর অতি নিকট সম্পর্কই ব্যক্ত হয়েছে। প্রভু ছাড়া যার কেও নেই প্রভু তাঁর মাতা, পিতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতি জাগতিক সমস্ত সম্পর্কের অভাব পূরণ করেন এই মর্মার্থটি তাঁর অভঙ্গগুলিতে স্পষ্ট। মহীপতির 'ভক্তবিজয়' এ পাওয়া একটি গল্প অনুসারে, একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে বারকরীরা বিঠঠল বলে ডাকতেন, নামদেবের বাড়িতে ভোজ খেতে এসেছিলেন। পুরো পরিবার তাঁর সঙ্গে খেতে বসলেও জনা বাইরেই রয়ে যান। তাঁর বিষণ্ণতা দেখে শ্রীকৃষ্ণের খিদে চলে যায়, তাই তিনি ভালভাবে না খেয়ে উঠে যান। এরপর জনা বাঈ উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো সংগ্রহ করেন। সেই রাতে বিঠঠল ভগবান জনার কুটিরে গিয়ে তাঁর সাথে খাবার খান, তাকে শস্য পেষায় সাহায্য করেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেলে তিনি তাড়াহুড়োয় তাঁর কম্বল ও গয়না জনার কুটিরে ফেলে রেখে মন্দিরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। জনাকে এই জিনিসগুলি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়, কিন্তু কেবল শ্রী বিঠঠলের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। এখান থেকে বোঝা যায়, সেই সময় সমাজে একজন নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ছিল তীব্র। জনা বাঈয়ের অভঙ্গগুলিতে শস্য পেষাই ও ঝাড়াইয়ের ছন্দ রয়েছে যা মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী লোকগান 'ওভি' র প্রতিফলন।

বহিনা বাই:

সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের দেইগোয়া গ্রামের এক গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারে বহিনা বাঈ জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন একমাত্র নারী সন্ত যিনি নিজের আত্মজীবনী লিখেছেন। তিন বছর বয়সে জনা বাঈয়ের সঙ্গে রত্নাকর পাঠক নামক একত্রিশ বছর বয়সী এক পুরোহিত ও জ্যোতিষীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ভক্তির জন্য তাকেও অনেক নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। তাঁর অনেকগুলি অভঙ্গ তাঁর দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন এবং সেগুলোর সমাধানের বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। বর্তমানে প্রাপ্ত তাঁর ৪৭৩ টি অভঙ্গের মধ্যে ৭৮টি অভঙ্গের প্রথম

অংশে বহিনা বাঈ তার জীবনের শৈশবকাল থেকে শুরু করে নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। ছোটবেলা থেকেই অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা অপেক্ষা তিনি ঈশ্বরের নাম জপ করতেই অধিকতর পছন্দ করতেন। বহিনা বাঈ কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত বিহঙ্গের মত তাঁর প্রেমিক রুপী ঈশ্বরের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াননি বরং তাঁর স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়নতা এবং ঈশ্বর ও সাধু সন্তদের প্রতি ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। বহিনা বাঈ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- "আমার বয়স এখন ১১ বছর কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও সুখ পাইনি"। একদা তাঁর স্বামীর অত্যাচারে তাঁর এক প্রাণপ্রিয় বাছুর মারা গেলে বিহনা গভীরভাবে শোকা হত হয়ে পড়েন এবং তিনদিন ধরে অচৈতন্য হয়ে যান। সেই অবস্থায় তিনি স্বপ্নে বিঠোবার দর্শন লাভ করেন এবং তুকারামের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী বিষয়টি মোটেই পছন্দ করেনি কারণ তুকারাম ছিলেন একজন নিম্ন বর্গের মানুষ আর তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর স্বামী তাকে নির্যাতন করতে শুরু করে এবং তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। হঠাৎ তাঁর স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বিহনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি পরে বিহনার ভক্তি পথকেই নিজের পথ হিসেবে গ্রহন করেন।

জাহ্নবা দেবী:

গৌরাঙ্গদেবের পর বাংলায় বৈষ্ণবীয় আন্দোলন পরিচালনার মুখ্য সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নারীরা। তাঁরা শুধু শিক্ষিতাই ছিলেন না তার সঙ্গে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্ত্রী গুরু হিসেবে সম্মানিত। চৈতন্য পরবর্তী আমলে বৈষ্ণব আচার্যদের পাশাপাশি এই স্ত্রী গুরুরাও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এমনই এক উল্লেখযোগ্য নারী হলেন জাহ্নবা দেবী। তাঁর জন্ম হয় ১৫০৯ সালে অম্বিকা, কালনায়। পিতা সূর্য দাসের দুই কন্যা ছিলেন বসুধা ও জাহ্নবা। ১৫২১ সালে নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় বসুধা ও যৌতুক স্বরুপ জাহ্নবাকে নিত্যানন্দের কাছে সম্প্রদান করেন সূর্য দাস। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রয়াণের পরেই জাহ্নবা দেবীর ভূমিকা বৈষ্ণব সমাজে ক্রমশ বাড়তে থাকে। নিত্যানন্দ প্রভুর সুবিশাল শিষ্যমণ্ডলীকে পরিচালনা ও সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি অন্তত তিনবার বৃন্দাবন যাত্রা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। খড়দহ থেকে তিনি প্রথমে যান কাটোয়ায়, এরপর একে একে মৌরেশ্বর, একচক্রা, গৌড় হয়ে গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুর পাদ পদ্ম দর্শন করে বৃন্দাবনে পৌঁছান। বৃন্দাবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। তিনিই প্রথম বৈষ্ণব মহিলা যিনি ভ্রমণের মাধ্যমে চৈতন্য ভক্তি প্রচার করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ থেকে বৃন্দাবন যাত্রা এত সহজ ছিল না। পথে ছিল ডাকাত আর দস্যু আক্রমণের ভয়। জাহ্নবা দেবীকেও একাধিকবার আক্রান্ত হতে হয়েছিল, কিন্তু শেষমেষ দস্যু দল তাঁর মহিমা অবগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করে। নিত্যানন্দ প্রভুর মৃত্যুর পরে বিধবা হয়েও তিনি সপত্নী পুত্র বীরচন্দ্রকে দীক্ষাদান করেন, যেটা সেই সময়ের সমাজে দুঃসাহসিক ছিল। কথিত আছে, বীরচন্দ্র প্রথমে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে রাজি না হলে জাহ্নবা দেবী নিজের ষড়ভুজ মূর্তি প্রকাশ করেন এবং তারপর থেকেই বীরচন্দ্রের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন ঈশ্বরী। তাঁর আর একটি অন্যতম কৃতিত্ব ছিল ১৫৮২ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত খেতুরি মহোৎসবে বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্বদান করা। এই উৎসবে তিনি নরোত্তম দাসকে ব্রাহ্মণ উপাধি দেন এবং এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন জাতপাত অপেক্ষা ঈশ্বর ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জাহ্নবা দেবী নিজে কোন রচনা না করলেও অনেক বৈষ্ণব কবি ও পণ্ডিতকে বৈষ্ণব পদ, গ্রন্থ ও তত্ত্ব রচনায় উৎসাহ দিতেন। তারই আদেশে ভক্ত কবি নিত্যানন্দ দাস "প্রেম বিলাস" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে রাধা গোপীনাথ মন্দিরে গোপীনাথের শ্রী অঙ্গে তিনি লীন হয়ে যান এবং গোপীনাথের ডান দিকে অনঙ্গ রাধিকার রূপ পরিগ্রহ করেন।

তাঁকে নিয়ে রচিত কাব্যের মধ্যে রয়েছে রামচন্দ্র গোস্বামী রচিত 'অনঙ্গমঞ্জরীসম্পূটীকা', গীতগোবিন্দ রচিত 'জাহ্নবাতত্ত্ব মর্মার্থ', সুভদ্রা দেবী রচিত 'অনঙ্গকদম্বাবলী', জীব গোস্বামী রচিত 'জাহ্নবাষ্টকম'।

সীতা দেবী:

সীতা দেবীর পিতা ছিলেন নৃসিংহ ভাদুড়ী। পণ্ডিত ভাদুড়ীর দুই কন্যা ছিলেন সীতা ও শ্রী। যদু নন্দনের পৌরোহিত্যে দুই বোনের বিবাহ হয় কুবের আচার্যের পুত্র কমলাক্ষর সঙ্গে। পরে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর কমলাক্ষর নতুন নাম হয় অদ্বৈত আচার্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বলেছেন, নিমাইয়ের জন্মের পর সীতাদেবী এবং অদ্বৈত আচার্য নিমাইকে দেখতে এসেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের ধর্মাচরণের প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। শ্রী চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর অস্থির বৈষ্ণব সমাজে সমতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিষ্ণুপুরে পাঁচ হাজার বৈষ্ণব নারীদের একটি সম্মেলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমকালীন বৈষ্ণব সমাজে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও ছিল। সীতা দেবীর জীবনীকাব্যের মধ্যে আছে বিষ্ণু দাসের 'সীতাগুণকদম্ব', ও লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'। আজও শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বিগ্রহের পাশাপাশি তিনি পূজিত হন।

হেমলতা ঠাকুরানী:

শ্রীনিবাস আচার্যের তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। কন্যাদের মধ্যে হেমলতাই ছিলেন জ্যেষ্ঠা। 'গোবিন্দবিলাস', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা যদুনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য ছিলেন। তারই নির্দেশে যদুনন্দন দাস 'কর্ণানন্দ' কাব্যটি রচনা করেন। মধ্যযুগে নারী শিক্ষার বিশেষ অবসর না থাকলেও হেমলতা দেবী বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অতীব দুরূহ বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে তিনি অপ্রাকৃত ধর্ম ও জীবনকে প্রাকৃতজনের বোধগম্য করে তোলেন। তাঁর রচিত 'মানবীবিলাস' কাব্যে তাঁর এই সহজ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি মানব কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি মালিহাটি বৈষ্ণব শ্রীপাট যা একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র ছিল সেটি পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

উপসংহার:

পরিশেষে এই কথা বলা যায়, ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে এই নারী ভক্তদের অবদান ছিল নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। ভক্তি আন্দোলনের মূল বাণী প্রচারে এই নারীদের জীবন ও উদ্যোগ প্রামাণ্য স্থান অর্জন করেছে। ব্রত আচার নয় বরং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই যে মূল ভক্তি এবং তাঁর মাধ্যমেই যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেটাই এই নারী সন্তরা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তাদের ব্যাক্তিগত জীবন ও রচনা দুটোই প্রাসঙ্গিক। ভক্তিকে অবলম্বন করেই তাঁরা সাহস অর্জন করেছেন এবং প্রয়োজনে পুরুষশাসিত সমাজের বেড়াজাল ভেঙে ঈশ্বরের অন্বেষণে বাইরে বেরিয়ে পড়তেও দ্বিধা করেননি। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই নারীদের প্রত্যেকের জীবন স্বকীয় হলেও একটি দিকে মিল ছিল, তা হল ভক্তি। শেষ পর্যন্ত এই ভক্তির মাধ্যমে তারা প্রত্যেকেই তাদের চরম লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছিলেন এবং ভক্তিকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে তারা উপলব্ধি করান যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়া যায়। ভক্তির পথে সাধারণ মানবী হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও আজ আমাদের কাছে তারা সকলেই ঈশ্বরী এবং পূজনীয়। এর পাশাপাশি তাদের জীবন সংগ্রাম থেকে তৎকালীন সমাজব্যাবস্থারও প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ একজন নারীর পক্ষে সুগম ছিল না, এমনকি ভক্তির ক্ষেত্রেও নয়। তাদের অনেককে নিপীড়নের শিকার এবং বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একজন নারী হিসেবে সমাজে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হত

তাঁরা তার উল্লেখ তাঁরা করেছিলেন বারংবার। কিন্তু তা সত্তেও তাঁরা কখনো ভক্তির পথ ত্যাগ করেননি। তৎকালীন সমাজব্যাবস্থায় দাড়িয়ে তাঁদের এই লড়াই আজ সত্যিই তাই প্রশংসনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমসাময়িককালে তাদের জীবন ও বাণীকে তুলে ধরার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। তাই এমন অনেক নারী ভক্তই রয়েছেন যারা আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছেন। তবে আজকের প্রেক্ষপট থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ভক্তি আন্দোলনকে সার্থক করে তূলতে নারী জাতির অবদানে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, নারীরা কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিল না এবং আজও নেই। যদিও প্রচলিত পুরুষশাসিত ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে নারীবাদকে তুলে ধরার প্রবণতা নয়, বরঞ্চ ভক্তিই তাঁদেরকে চালিত করেছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা পরোক্ষভাবে সমাজ এবং ইতিহাসে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। তাই না চাইতেও তাঁরা সমসাময়িক এবং বর্তমান যুগে নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন তাদের ভক্তির মাধ্যমে। তাদের এই সংগ্রাম এবং অসামান্য অবদানের জন্য আপামর ভক্ত সম্প্রদায়, নারী জাতি, সমাজ ও ইতিহাস চিরজীবন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীমানী, সৌমিত্র । ভারতের মধ্যযুগ । নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৮৭-৪৯০।

২. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার । আদিমধ্য ও মধ্যযুগে ভারত ৬৫০-১৫৫৬ । রাওয়াত পাবলিকেশনস, জয়পুর,১৯১৯, পৃ. ৪৮৭-৪৯০।

৩. সাহা, অমরেন্দ্র নাথ। বৈষ্ণব দর্পণ। পুস্তক বিপনি, কলকাতা,১৯৬৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

৪. পাল, প্রমা। ষোড়শ শতকের আধুনিক নারী জাহ্নবাদেবী। Trisangam International Refereed Journal (TIRJ), সংখ্যা ৫, ২০২৫, পৃ. ৩-৪।

৫. Pande, Rekha. Women's voice in Bhakti literature. Research in world Literature, (A refereed Journal in literature Studies), 2012. p.70-71.

৬. Ibid, p.80-81.

৭. Mullatti, L. The Bhakti movement and the status of women: A case study of virasaivism. Abhinav Publications, 1989, p.4-5.

৮. Kaul, Jaya Lal. Lal Ded. Sahitya Academy, 1973, p.47-49.

৯. Tharu, Susie. , Lalita, K. Women writing in India : 600 B.C. to the present. Feminist Press, New York, 1991, p.107-108.

১০. Kumaracharya, V.S. Musings on SAINT ANDAL'S TIRUPPAVAI. D.V.K. Murthy, Krshnamurthipuram, Mysore, 2002, p.11-13.

১১. Ibid, p.28.

১২. Bhattacharyya, N.N. Medieval Bhakti Movements in India. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd, New Delhi, 1989, p.149-153.

১৩. Mudaliar, Chandra Y. Religious experiences of Hindu Women: A Study of Hindu Women: A Study of Akka Mahadevi. Mystics Quarterly, Penn State University Press, 1991, p.137-146.